উদ্বোধনী ভাষণ

বিষণ্ন বিষয় ও বাংলাদেশ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সাবেক প্রধান বিচারপতি
ও
সাবেক প্রধান উপদেষ্টা
তত্বাবধায়ক সরকার, ১৯৯৬
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আমাদের দেশের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এই সমিতি কর্তৃক আহুত সম্মেলনে ও সভায় দেশী ও বিদেশী বহু গুনীজন ও বিদগ্ধপণ্ডিত বক্তৃতা করে গেছেন। আজ সমিতির ১৪তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ আমাকে যে সম্মানিত করেছেন তার জন্য আমি বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করছি। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বায়নের শুরু হয়। তার পুরো ফায়দাটা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সাফল্যের সঙ্গে আত্মস্থ করে। শিল্পবিপ্লব, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা, মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার, সীমিত দায়বদ্ধ কোম্পানি আইনের উদ্ভব ইত্যাদি এক জটিল প্রক্রিয়ায় আধুনিক ইউরোপীয় অর্থনীতির জন্ম। অর্থনীতি সম্পর্কে সেখানে বিতর্কের শেষ নেই। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, কেন্‌জ, হায়েক, ফ্রিডম্যানরা সবাই এক সুরে কথা বলেননি। একেক সময় একেক ব্যবস্থা আশ্চর্যজনকরকমভাবে সাফল্য লাভ করে। মার্ক্যান্টালিজম অনেক দিন রাজত্ব করে। ফ্রি ট্রেড বা মুক্তবাণিজ্য সমাজতন্ত্রবাদীদের নিয়ন্ত্রিত বা পরিকল্পিত অর্থনীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয়। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা এখনও টিকে আছে। সামন্ত অর্থনীতি থেকে সোভিয়েত রাশিয়া এমন দ্রুতগতিতে আধুনিক যুগের দরজায় ধাক্কা দেয় যে, মৌলবাদী পুঁজিবাদীরা সপ্রশংসদৃষ্টিতে, অন্তত স্পুটনিক-উৎক্ষেপণ কাল পর্যন্ত, সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি ব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে থাকে।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ব্রিটেন যে মুক্তবাণিজ্যের মন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে প্রভাবিত হয় কর্‌ন্ ল আইন তুলে দিয়ে অদক্ষ দেশী কৃষকদেরকে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়। তার পূর্বে প্রায় দেড়শ বছর ধরে মুক্তবাণিজ্যের সব আইন-রেওয়াজ ভঙ্গ করেই দেশটি শিল্পায়নে সাফল্য লাভ করে। সাতসমুদ্রে ব্রিটিশ নৌশক্তির প্রাধান্যের কারণেও দেশটির অভূতপূর্ব বাণিজ্যবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন উন্নয়নশীল দেশ তখন লেসে ফেয়ার-বাণিজ্যে সরকারের হস্তক্ষেপ না-করার নীতির কথা কেউ বলত না। যখন দেশটি উন্নত হয়ে শক্ত ও

প্রবল হলো, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, তখন এমন তত্ত্ব প্রচার করা হলো যেন জন্মলগ্ন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তবাণিজ্য বা মুক্তবাজার নীতি অনুসরণ করে আসছে। দেশটির জন্ম এবং স্মিথের ওয়েলথ অব দ্য নেশনসের প্রকাশ একই বছরে। ফ্রান্স বা স্পেনের মতো মারক্যান্টালিস্ট নীতি অনুসরণ না করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিদেশী পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের মাধ্যমে প্রায় দেড়শ বছর ধরে দেশীয় বাণিজ্যকে মদদ দিয়ে বাইরের প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

পুঁজিবাদের দুর্দিন ছিল পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে। ১৯১৭ সালে তার নাভিশ্বাস ওঠে। ১৯২৯ সালে তাকে যে মরণদশা পেয়ে বসে তার থেকে ১৯৩৩ সালের পর সরকারের সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ হয়। সরকারের খবরদারি মুক্তবাজারের প্রবক্তারা পছন্দ করেননি কোনো দিন। সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রের একটা বড় ধরনের পতনের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনীতিবিদরা একটা ভাব করছেন যে, ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথের দ্য ওয়েলথ অব নেশনস প্রকাশিত হওয়ার পর সারা বিশ্বের অর্থনীতি মুক্তবাজারের সূত্রমতে সব ঠিকঠাকই চলে এসেছে। সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ বছর ধরে ইংরেজিভাষী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি দুটো যে প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই প্রভাববলয়ে বাস করে দ্বিতীয় বা অন্য কারো কথা শোনার আমাদের সুযোগ হয়নি।

আমরা ইংরেজদের উপনিবেশ ছিলাম। ইংরেজি ভাষার বাইরে বৃহৎ যে বিশ্বের অবস্থান তার প্রধান প্রধান দেশ সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। মুক্তবাজারের যে তত্ত্ব ইঙ্গ-মার্কিন দার্শনিকরা দিচ্ছেন, তা কি জার্মানি ও ফ্রান্সে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়?

ইউরোপের মহাদেশীয় ভূখণ্ডে বাজারের সাফল্যের অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস করেননি জার্মান অর্থনীতিবিদ ফ্রিডরিক লিস্ট এবং তাঁর প্রভাব রাশিয়া, জাপান ও চীনের অর্থনীতিবিদদের কর্মতৎপরতায়ও বেশ পরিলক্ষিত হয়।

ইঙ্গ-মার্কিন চিন্তাধারায় স্বয়ংক্রিয় উন্নয়ন, ভোগের জন্য পণ্য সরবরাহ, ফলাফলের চেয়ে প্রক্রিয়ার প্রতি ও সমষ্টির চেয়ে ব্যাষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদির ব্যত্যয় অ্যাডাম স্মিথের লেখার মধ্যেও ছিল। স্মিথের কাছে যুদ্ধ সবচেয়ে শিল্পকলা এবং ইংল্যান্ডের নৌ-পরিচালনার আইন বিজ্ঞতম বাণিজ্যিক কানুন। তিনি রাষ্ট্রের সংরক্ষণমূলক বিধান প্রণয়ন এবং শুল্ক আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বাজারের ব্যর্থতার দিকে লক্ষ করে স্মিথ হয়তো আজ সরকারের হয়ে ওকালতি করতেন যেমন অতীতে করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, ব্রিটেনে কেনজ্ এবং অন্যান্য দেশে তাঁর অনুসারীরা। জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক কাঠামোয় সরকারের স্থানকে কোনো মতেই নগণ্য বলা যাবে না। বাজারের তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় উন্নয়নে এসব দেশ বিশ্বাস করেনি। সমাজতন্ত্রী দেশগুলোতো বটেই, মিশ্র অর্থনীতির প্রবক্তা ভারত ও তার অনুসারী দেশগুলোও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে *ওয়ল স্ট্রিট জর্নালের* কলামিস্ট ওয়াল্ট মসবার্গের একটা কথা মনে হলো। তিনি বলেছিলেন, 'জাপান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সফল কমিউনিস্ট দেশ।' আসলে এটি এমন একটি দেশ যেখানে কমিউনিজম বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাস্তবে কাজ করে। শীতল যুদ্ধের সময় জাপান এত সঞ্চয়ের স্তূপ গড়ে তোলে যে বিশ্বায়নের প্রথম দশকের ধাক্কাটা দেশটা সহজে সহ্য করতে পারে। কোরিয়া জাপানকে অনুসরণ করে, কিন্তু সঞ্চয় তেমন করতে পারেনি। তাই ধাক্কা সামলাতে দেশটাকে কষ্ট করতে হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর উত্থানকালে মুক্তবাজারের নৈতিকতা প্রসঙ্গে সঠিক দর নির্ধারণ, ভোক্তার স্বার্থ ইত্যাদি প্রশ্নগুলো অবলীলাক্রমে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়। প্রতারণা, চুক্তিভঙ্গ, দুর্বলের প্রতি অসম প্রভাব বিস্তারের ঘটনা ঘটে অহরহ।

যেকোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করবে সমাজ কীভাবে সরকার ও বাজারের ব্যর্থতা প্রতিহত করে এবং এহেন ব্যর্থতার জন্য যে জাতীয়, সামাজিক ও নৈতিক পুঁজি যে অবক্ষয় ঘটে তা কিভাবে রোধ করা হয়।

অধিকতর প্রবৃদ্ধির জন্য দেশের মানবসম্পদ ও ভৌত পুঁজিকে কীভাবে ব্যবহার করা হয় সে নিয়ে আজকাল তত্ত্বগত পার্থক্য অনেক কমে এসেছে। সরকার আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগের দায়িত্ব নিলে, মুনাফার স্বার্থে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ হবে এবং মুক্তবাজারের সুফল আশা করা যায়। দারিদ্র্য বিমোচনে সামান্য অগ্রগতিও টেকসই উন্নয়নে বড় সহায়ক হবে। সবাই এমন কথা বলছেন।

বাজারের সাধারণ ধর্ম সস্তায় ক্রয় ও আক্রায় বিক্রয়। সেই বাজারে যে প্রতিযোগিতায় টিকবে সে বাঁচবে। যে টিকবে না তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে হবে। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে আমাদের দেশে দেউলিয়া আইন হয়েছে, তার প্রার্থিত ফল কই, দেখা তো যায় না। ঋণের তফসিল পরিবর্তনের নানা আইনি কারসাজিতে ঘোর খেলাপিও বাজারে সদম্ভে বিচরণ করে বিদেশে সরকারপ্রধানের সফরসঙ্গী।

আন্তর্জাতিক বাজার দয়ামায়াহীন। সেখানে দরকষাকষি করতে গিয়ে লোকসান দিয়েও মাল বিক্রি করতে হয়। কমপ্যারেটিভ কস্ট-তুলনামূলক ব্যয়ের সুযোগকে হাতে ধরে কেউ বিনষ্ট করে না। বেশি হিসেবিদের মুক্তবাজারে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ভয় করে। ঝুক্কি নিতে হিম্মত লাগে। তারই আর এক নাম উদ্যোগ। এই উদ্যোগ ব্যক্তিগত উদ্যোগের নব অবতার গণেশায় নমঃনমঃ করছেন সাম্প্রতিককালের বহু অর্থনীতিবিদ। শুধু পোশাক পরিচ্ছদে নয়, জ্ঞানের জগতে বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের জগতে চোখধাঁধানো হালফ্যাশনের অতুক্তি বিভ্রমের সৃষ্টি করে।

মুক্তবাণিজ্যের মোদ্দা কথা, টাকার জোর যার বাজার তার। যে মুক্তবাজার মুক্ত বিনিয়োগের কথা বলে সে বাজারে দরিদ্র দেশের প্রবেশাধিকার নেই। দরিদ্রের শ্রম অবশ্য দেশী-বিদেশী সকল মুনাফাখোরীদের কাছে বড় আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। না খেয়ে মরার চেয়ে গায়েগতরে খেটে জীবন গুজরান করতেই হবে শ্রমিকদের, সে শ্রমিক ধনী দেশের বা দরিদ্র দেশের হোক। ধনী দেশের কর্তাদের কাছে তাঁদের দেশের শ্রমিকস্বার্থও তুলনামূলকভাবে তেমন প্রাধান্য পায় না। শ্রমিকদের অবশ্য বচনে তুষ্ট রাখার চেষ্টা হয় এবং মানবাধিকারের নামে অনুন্নত দেশের শিশুশ্রম ও বেগারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সোচ্চার হন মুক্তবাজারের হোতারা।

বাজারানুরাগীরা বাজারের কার্যকারিতা, মাহাত্ম্য ও ভবিত্যবতা বর্ণনা করার সময় এক মুগ্ধাবেশে অবস্থান নেয়। আজকের চলমান সংস্কৃতিতে মানুষকে মানুষ অমুক্ত রাখতেও রাজি, কিন্তু আ-বর্ণ সকলেই প্রাণনাথ বাজারকে মুক্ত রাখতে চায়। এখন বাজার ধর্ম, বাজার স্বর্গ এবং বাজারই পরম তপ। বাজার পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক অর্থনীতির সেমিনারে তার জন্য প্রার্থনাসম ওম-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। বাজারের পুরোহিতরা চান, দেশের সরকার বাজার-সরকার হোক। প্রয়োজন হলে বাজারের স্বার্থে জঘন্য স্বৈরশাসকের সঙ্গে যোগসাজশ করা চলবে। নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত করে দিতে হবে। দুর্বিনীত শ্রমিক নেতাদের জব্দ করার জন্য নাগরিক ভোক্তাদের হাতে সসপ্যান

ও চামচা-তুলে দিয়ে পেছন থেকে উসকানি দেওয়া জায়েজ হবে। নির্বাচিত সরকারের পতনের জন্য তারা ঝনঝনা বা ডুগডুগি বাজাক না।

বাজারের অগ্রগতি ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের সরকার ও সুশীল সমাজের ওপর। বাজার যে চাহিদার যোগান দিতে অসমর্থ তা সরকার বা সুশীল সমাজকে যোগান দিতে হবে এবং তা না দিতে পারলে বাজার ও সরকার উভয়েই ব্যর্থতায় ক্লেদাক্ত হবে। বাজারে ন্যায্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা বাজার দিতে পারবে না। বাজারের একটা প্রবণতা রয়েছে স্বয়ং একচেটিয়া হওয়ার। একচেটিয়া বাজারের দোষময়তা থেকে কেবল সরকারই যথাযুক্ত বিধান দিতে পারে বা সমাজের চাপে বিধান দিতে বাধ্য হয়।

বাজারতত্ত্ব ব্যক্তির আত্মস্বার্থের ওপর জোর দেয়। সেই আত্মস্বার্থ চরিতার্থের জন্য যখন কেউ লোভ, অসততা ও অনৈতিকতার আশ্রয় নেয় তখন তাকে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ধর্মের কল বাতাসে না নড়লে, বা স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কিত ন্যায়াদর্শকে অবজ্ঞা করা হলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর এক ধরনের বিশ্বায়ন হয়েছিল। নিজেদের দুর্গতির অবসানকল্পে বিশ্বের শ্রমিক 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে ডাক দিয়েছিল। সে-সময় *অন্তর্জ্ঞান্যাশনাল* গান গেয়ে শ্রমিকদের জমায়েত শুরু হতো। এখন অনেক প্রাক্তন সাম্যবাদী দেশে আর মে-দিবস পালিত হয় না। পশ্চিম ইউরোপে সমাজবাদী কাঠামোকে অবশ্য শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলা সম্ভব হয়নি। বাবুশ্রমিক দলদের সফরসঙ্গীর মধ্যে আজ বহু ব্যবসায়ীকে দেখা যায়। শ্রমিক দলের নির্বাচনী কড়ি যোগান দেয় বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এখন নতুন বিশ্বায়নের যুগে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং আরো আসবে। ফিদেল ক্যাস্ত্রো কখনোসখনো ফ্যাটিগ ছেড়ে বিজনেস স্যুট পরছেন। চীনা নেতারা আন্তর্জাতিক সমাবেশে হান ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় কথা বলছেন, দোভাষের দেয়াল ভেঙে। তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রে তেমন কোনো দলীয় বা রাজনৈতিক উর্দির বৈশিষ্ট্য নেই। সমস্বরে বারংবার উচ্চারিত হয়- ওপেনিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড। নিজ নিজ স্বার্থে বিশ্বের দিকে বাতায়ন খুলে দিতে চায় আজ সবাই।

শিল্প বিপ্লবের ফলে এক নতুন সমাজব্যবস্থার মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল এবং ভেবেছিল বিজ্ঞানের বদৌলতে তা অর্জন করা সম্ভব হবে। অগ্রগতি হয়েছে বিস্ময়কর, স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে নিদারুণ। আজ সাম্প্রতিককালের তথ্য বিপ্লবের ফলে ব্যক্তির ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনকার বাম চিন্তাবিদদের কেউ কেউ বলছেন মানব উন্নয়নের যে সম্ভাবনা আজ নাগালের মধ্যে, সে অবস্থার কথা পূর্বে কোনো সমাজবাদী বা সাম্যবাদী, তাত্ত্বিকরা চিন্তাও করতে পারেননি। স্বপ্ন দেখার জন্য এখনই সময়, বড়ই সুসময়।

'বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ শিখর জয় লাভই হচ্ছে সমাজতন্ত্র।' কথাটা বিংশ শতাব্দীর দুইয়ের দশকে সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিন, না পাঁচের দশকে ব্রিটেনের শ্রমিক নেতা বিভান বলেছিলেন–এ নিয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। সমাজতন্ত্রের প্রতি এ ধরনের অনুরাগ সর্বত্র ছিল না। ১৯৬০ সালে গুনার মিরডাল বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং কিছুটা কম হলেও অন্যান্য ধনী ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রগামী পশ্চিমা দেশের পাবলিক বিতর্কে সব সময় 'মুক্ত' বাণিজ্যের অনুসারীরা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রায় সর্বত্র একটা অখ্যাতি ছিল এবং আমেরিকায় একে বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকৃতি এবং এমনকি রাজনৈতিক সাবোতাশ হিসেবে বিবেচনা

করে। সাত বছর পরে জন কেনেথ গলব্রেথ অবশ্য বলছেন–'পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থনীতি জনগণের কাছে অপ্রিয় তো নয়ই, বরং যারা এ ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন তারা একে সমাদরে বিবেচনা করে থাকেন।'

সমাজে নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক চাহিদা রয়েছে, যা বাজার যোগান দিতে উৎসাহবোধ করে না। জননিরাপত্তা, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, আইন-আদালত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বা প্রতিরক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব বাজার নেয় না। বাজারের ব্যবসায়ীরা ঠিকাদার হিসেবে কাজ করতে পারে, লাভের আশায় গবেষণায় চাঁদা দিতে বা অংশগ্রহণ করতেও পারে, কিন্তু এসব ব্যাপারে কেউ দায়িত্ব নিতে চাইবে না এবং কোনো সুস্থ সমাজই এসব দায়িত্ব ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দিতে চাইবে না, চন্দ্রপৃষ্ঠে ব্যক্তিউদ্যোগে মহাকাশ অভিযান সম্ভব হলেও।

বাজারের ব্যবসায়ীরা কোনোদিন সামাজিক ও পরিবেশগত পরিব্যয়কে হিসাবের মধ্যে নেয় না। সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া বাজারকে পরিবেশ ও সমাজের ওপর যদি অবাধ দৌরাত্ম্য করতে দেওয়া হয়, তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাজারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে সমাজের যে মূল্যবোধ বিরাজ করে তার সংরক্ষণেও বাজারের তেমন কোনো মাথাব্যথা থাকে না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, সুষম উন্নয়ন এবং শান্তিশৃঙ্খলা ও ন্যায়পরতার জন্য সরকারকে বাজার ও ভোক্তাদের মধ্যে, বাজারের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এবং বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ ও পুঁজি সরবরাহকারীদের উদ্ভূত বিভিন্ন বিরুদ্ধ-স্বার্থের সমন্বয় সাধনের জন্য সরকারকেই মধ্যস্থতা করতে হয়।

বাজার যা নগদ পায় তাই হাত পেতে নেয়। মুনাফা ছাড়া ভবিষ্যতের তার জন্য তেমন ভাবনা নেই। দেশের মঙ্গলের স্বার্থে ও পৃথিবীর সার্বিক মঙ্গলে সরকারকে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু বাজারের সুবিধার জন্য এবং ব্যবসার সুবিধার জন্য সরকার নিয়ম করবে, কিন্তু বাজারের দৌরাত্ম্যরোধে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারবে না, এমন রাষ্ট্রাদর্শ কোনো দেশেই নেই।

আবার, যারা সরকারভরসাকারী তাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে সরকার যানজট ঠেকাতে না পেরে সেনা মোতায়েন করেছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা পালন করতে সরকার মাসের পর মাস সময় নিচ্ছে এবং সময় নিয়েও আদালতের হুকুম পালন করছে না। সংবিধান-আরোপিত কর্তব্য নির্বাহী বিভাগ অবলীলাক্রমে পালন না করে ১০ বছরের অধিক কাল কাটিয়ে দিয়েছে। সরকারি ও আধাসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কোটি কোটি টাকার বিল পরিশোধ না করে শীর্ষস্থানীয় খেলাপি হিসেবে আজ চিহ্নিত। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সংবিধান নির্দেশিত ব্যবস্থা এ দেশে নেওয়া হয় না। এহেন দেশের সরকারের পক্ষে বাজারের চাহিদা-যোগান, উঠতি-পড়তি, লাভ-লোকসান, দরকষাকষির মাধ্যমে লেনদেন গ্রহণ-বর্জন এবং ঝড়-ঝক্কি-ধাক্কা সহ্য করে চলনসই কাজসারা স্থিতি রক্ষা কি সম্ভব? বাজারের সামান্য ভার নেওয়ার আগে সরকারকে আইনানুগত হতে হবে এবং সকল নাগরিককে সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ এবং আইনের আশ্রয় দিতে হবে।

সমাজতন্ত্র বনাম মুক্তবাণিজ্যের যুদ্ধে সমাজতন্ত্র হেরে গেছে, যত না দার্শনিক কারণে তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্নীতির কারণে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠার পর প্রায় চার দশক ধরে রক্তক্ষয়ী দুদুটো মহাযুদ্ধ এবং লাগাতার অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-হার ছিল চমৎকার। পরে প্রশাসনে ব্যাপক দুনীতির

ফলে রাষ্ট্রের মেধা ও বুদ্ধি প্রায় অচল হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় যখন দুর্নীতি প্রবল হয়ে দেখা দেয় তখনো বলা হয় পুঁজিবাদের আন অ্যাকসেপটেবল ফেস- অগ্রহণযোগ্য ছিরি-চেহারার কথা। যুগপৎ মতান্ধ ও দুর্নীতিবাজ সমাজতন্ত্রীরাই সমাজতন্ত্রের ছব্বা-মুখশ্রী বিনষ্ট করেছে।

অর্থনীতির বাঁকেবাঁকে যে বিস্ময় রয়েছে তাকে কী অস্বীকার করা যাবে? আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, রেফ্রিজারেটর ও রঙিন টেলিভিশনের কাছে কাল মার্কস হেরে গেছেন। সোভিয়েত ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অনর্জিত আয় পার্টি সদস্যরা উপভোগ করতে এমনি অভ্যস্ত হয় যে এক বিরাট মাথাভারী সাম্রাজ্যিক কাঠামো হঠাৎ করে ভেতর থেকে ধসে গেল। ধরাতলে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে একটা গুলিও ছোড়া হলো না বা আকাশ থেকে বেপথুমান কোনো তারকাও ভেঙে পড়ল না ডন বা ভল্গা নদীতে বা বৈকাল হ্রদে।

১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সদ্যবিমুক্ত উপনিবেশগুলোতে অর্থনৈতিক মুক্তি বা উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্র, নিদেনপক্ষে কেন্দ্রীয় অর্থনীতি বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আদৃত হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বে মিশ্র অর্থনীতির প্রবক্তা হিসেবে ভারতের প্রভাব ছিল ব্যাপক। বার্লিন প্রাচীর ভাঙার বা সমাজতন্ত্রী রাশিয়া বিনষ্ট হওয়ার পর যদি বাংলাদেশের অভ্যুদয় হতো তবে কি এ দেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করা হতো! বা এক ঢোক গিলে বা থুক্কু বলে 'সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন হতো! এই উপমহাদেশের দেশগুলো সংবিধানের এক দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক সংগ্রহশালা। সংবিধানের প্রস্তাবনারও সংশোধন হয়! প্রস্তাবনা প্রক্ষিপ্ত হলে যে তা হতে পারে।

সরকার আমাদের দেশে আমাদের মা-বাবা হিসেবে চিহ্নিত। আমরা আমাদের সমস্যা পূরণের জন্য স্বভাবত সরকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। ব্রিটিশ-পূর্ব সরকারের সময় সমাজের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকত। সরকারের সঙ্গে খাজনা দেওয়া ছাড়া তেমন সম্পর্ক ছিল না। সরকারের ক্ষমতা ও দাপট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র মানুষের সরকারনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের দেশেও।

আজ রাষ্ট্রায়ত্ত বা জাতীয়করণ শব্দদ্বয় কোনো কোনো অর্থনীতিবিদদের কাছে একেবারে অশ্রাব্য শ্রুতিকটু বলে মনে হয়। এখানে মনে রাখা দরকার বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের পাট, ব্যাংক ও বীমা জাতীয়করণের কথা বারবার উঠেছিল। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফায় অর্থনীতির যেসব প্রশ্ন ওঠে তা সব রাষ্ট্রের অপার ক্ষমতায় বিশ্বাসী মনের কথা। রাষ্ট্রক্ষমতায় বিশ্বাসী রাজনীতিকরা অর্থনীতিবিদদের দুই অর্থনীতির আলোকে ছয় দফা থেকে, অবশেষে এক দফায় স্বাধীন রাষ্ট্রের লক্ষ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন।

স্বাধীনতার পর অতি শিগগিরই, চার বছরের কম সময়ের মধ্যে, ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রনির্ভরতার পরিবর্তে ব্যক্তি-উদ্যোগের কথা বেশ জোরেশোরে বলা হলো। 'টাকা কোনো সমস্যা নয়'-এমন সব উদ্ভট কথাও শোনা গেল। বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক-বীমার প্রসারে এবং সরকার ব্যর্থতার কারণে যে খেলাপি সংস্কৃতির জন্ম হলো তার সঙ্গে ডাকাতজমিদাররা মিলে আজ দেশের অর্থনীতিতে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ যে 'নিতল ঝুড়ি' নয়', তা প্রমাণ করার জন্য এখন গলদঘর্ম গবেষণার প্রয়োজন নেই। তবে ঝুড়িটি নিশ্ছিদ্রও নয়। যার হাতে ঝুড়ি তার সদিচ্ছা, আত্মপ্রত্যয় ও সাহসের অভাব রয়েছে। দেশের মালিকের হাতছাড়া হয়ে ঝুড়িটি অপাত্রে পড়েছে কয়েকবার। দেশে ন্যায্যতার শৃঙ্খল ভগ্ন হয়েছে। গত

ত্রিশ বছরের দুজন রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা এবং অসংখ্য অস্বাভাবিক খুন জখম দুনীতির প্রতিকার না হওয়ায় উন্নয়নের জন্য এক প্রয়োজনীয় সুস্থ ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে। সান্ত্বনা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও উপপ্লব সত্ত্বেও দেশে গৃহযুদ্ধ বাধেনি। আফ্রিকার বহু দেশ আজ গৃহযুদ্ধের কারণে বড়ই বিপন্ন। মন থেকে অবশ্য আশঙ্কা দূর হয় না। আইনশৃঙ্খলার ক্রমাবনতি এবং শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক অনিয়ম ও অনাচারের জন্য দেশটি এক নম্বর দাগি দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পরপর গত দু বছর।

তবে ভরসা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে বেড়েছে। সত্তর দশকের শতকরা এক ভাগের কম প্রবৃদ্ধির হার আশির দশকে ১.৮% এবং নব্বই দশকে ৩% ভাগের উপরে উঠেছে। গালভরা সুশাসনের কথা বলব না। হতাশাব্যঞ্জক নয়, আশাব্যঞ্জকও নয়, চলনসই কার্যকর শাসন ব্যবস্থা থাকলে দেশের বর্তমান বিনিয়োগ ও উৎপাদন হেসেখেলে প্রবৃদ্ধির হার আর ২% ভাগ বাড়ত। নব্বই দশকে দারিদ্র্যের হার ৫৯% থেকে কমে ৫০% দাঁড়িয়েছে। তবে ৮৮টি উন্নয়নশীল দেশের বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। মানব উন্নয়নে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ১৪৫। এই সব নৈরাশ্যজনক পরিসংখ্যানের মাঝে আমার কাছে এটা একটা বড় খবর যে, গ্রামীণ পরিবারের উপার্জনকারীদের ৫২% জন আজ অ-কৃষি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৮৭-৮৮ সালে সেই হার ছিল ৩৭%। পেশাগত চলমানতা, যান্ত্রিক সেচ, যান্ত্রিক চাষ, রাস্তাঘাট ও শিক্ষার প্রসারের ফলে এবং গ্রামবাসীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তনের ফলে কৃষিভিত্তিক বৃত্তি ১৬% কমেছে এবং কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা অর্ধেক কমেছে।

শতাব্দী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছি। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মৃত্যুর হার কমেছে। প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু অতীতে যে সাফল্য অর্জন করা হয়েছে তা ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী মহাজন ও অর্থনীতি-পরামর্শকদের মতে, আমরা যথাযোগ্য কাঠামোগত সংস্কার করিনি। বাজেট ঘাটতি বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বড় বিপন্ন অবস্থা।

একটা বড় লক্ষণীয় ব্যাপার, বাংলাদেশে সরকারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, বাজারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সমাজে আনুপাতিকভাবে সেই ব্যর্থতা ঘটেনি। কৃষিখাতে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ও শিক্ষায় আশু ফললাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজ সাফল্য লাভ করেছে। সীমিত জনসংযোগের প্রচার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে সংস্কার এবং নবপ্রবর্তনাকে গ্রহণ করতে। মানুষ নানা ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন করছে। বাড়ির চারপাশে গাছ লাগাচ্ছে। বৃষ্টির পানিও ধরে রাখার চেষ্টা করছে। যেখানে-সেখানে পানি খাওয়ার জন্য বাঙালিদের যে দুর্নাম ছিল, তা অন্তর্হিত হচ্ছে। বোঝাতে জানলে পাগলও যে নিজের ভালো বোঝে!

পুঁজিবাদী উন্নয়নের পেছনে মূল চালিকাশক্তি পুঁজি। আর ইতিহাসে দেখা যায় সফল জাতগুলো বাজারের হাত মুচড়েই অতিরিক্ত টাকাটা সংগ্রহ করেছে। শিল্পের প্রসার নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর কিন্তু অনুন্নত দেশে অনেক সময় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটা বিরোধ জমে ওঠে সুদের আদর্শ হারকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে আমরা সুদের হার নিয়ে নানা ধরনের হিমশিম চেষ্টা করছি, যাতে বিনিয়োগে খাটানোর জন্য আরো বেশি পুঁজি পাওয়া যায়।

তত্ত্বকথা হিসেবে আমাদের দেশে শেয়ারবাজারের কথা অসংখ্যবার বলা হয়েছে। সেই বাজার সাধারণ আনপড়, নিঃবিত্তের নাগালের বাইরে। সেই বাজার তারা বোঝে না, সেখানে বিনিয়োগ করতে সাহস পায় না। বরং তারা দেশীয় প্রথায় জমি রাখবে, খাইখালাসিতে বিনিয়োগ করবে এবং মরসুম অনুযায়ী

দাদন দেবে বা মাল কিনে রাখবে, দর উঠলে বেশি দামে বিক্রি করবে। আমাদের দেশের বাজার সম্পুর্ণ বিশ্বাসের ওপর। আইনি পরামর্শের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতারা তেমন খরচ করতে চায় না। এমন সীমিত বাজারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বায়নের সমুদ্রে যাতে নাকানিচুবানি কম খেয়ে আমরা ভেসে থাকতে পারি সে ব্যাপারে সরকারকেই ভাবতে হবে, তা যতই দুর্নীতিপরায়ণ হোক না কেন!

নৈতিকতা সম্পুর্ণ বর্জন না করে তবে তাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা যে প্রকৌশল-অর্থনীতির কথা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় তার আদি গুরু কৌটিল্য। অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক *অর্থশাস্ত্র*-এর প্রণেতা কৌটিল্য বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে সমাজ, রাজার কর্তব্য প্রজ্ঞানুরঞ্জনে ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপালন এবং অর্থনীতির কথা আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটল, রিকার্ডো, মার্কস প্রমুখ ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদের কাছে ঔচিত্যের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণই। এখন যখন মানবিক অধিকার, ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি প্রশাসনের লক্ষ্যবস্তু বলে বিবেচিত, তখন সরকারকে সাক্ষীগোপাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। সরকারের দুর্নীতির ভয়ে এবং তার ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে মানুষ সরকারের ওপর ভরসা করে না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণখেলাপি, দু নম্বরি লেনদেন এবং ব্যবসায় সন্ত্রাসের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উদারপন্থীরাও বাজারের গুণগান করতে তেমন উৎসাহ পায় না।

আবার মুক্তবাজারের স্বার্থে বেসরকারিকরণের কথাও পদে পদে আমাদের শোনানো হয়। যেন বোতাম টিপেই বেসরকারিকরণ করা যায়। যে সমস্ত জিনিস সরকারের করা কর্তব্য তাও সরকার ও আমাদের স্বভাবগুণে বেসরকারি হয়ে গেছে। সরকারি হাসপাতালগুলো আজ নামে মাত্র সরকারি। চিকিৎসার ওষুধপত্র ও সরঞ্জাম বাইরে থেকেই কিনতে হয়। তারপর খাসলতের গুণেই বেসরকরিকরণের কোনো সুফল দেখা যায় না। প্রায় ৫০০টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার অর্ধেকের এখন কোনো নাম-নিশানা নেই। প্রতিষ্ঠানের অস্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য পরিসম্পৎ বিক্রি করে নগদ হাতিয়ে নিয়ে নতুন মালিক হাওয়া।

মুক্তবাজারে বিশ্বাসী পরামর্শদাতারা আমাদের সময়ে-অসময়ে সারের ওপর ভর্তুকির বিরুদ্ধে সবক দিয়ে যাচ্ছেন। ধনী দেশে শুধু সার নয় বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের ওপর এমনভাবে সার্বিক ভর্তুকি দেওয়া হয় এবং সেই দেয়াল এতই উঁচু হয় যে তা টপকানোর ক্ষমতা কোনো দরিদ্র দেশের নেই।

মুক্তবাজারের জন্য উন্নয়নশীলদের কাছে যেসব নাছোড়বান্দা দেশ ধরনা দিচ্ছে তাদের নিজেদের দেশের কেউ ইস্পাত বা ভারী শিল্পে এমন ভর্তুকি দিচ্ছে যে দরিদ্র দেশের পক্ষে তাদের বাজারে ঢোকা মুস্কিল। আবার কোনো কোনো দেশে কৃষিপণ্যের, ওপর এমন ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে যে সেখানে দরিদ্র উৎপাদকের সেখানে প্রবেশের কোনো উপায় নাই। কৃষিতে জাপান, কোরিয়া ও তাইওয়ানে তাদের ঐতিহ্য রক্ষার খাতিরে যে ভর্তুকি দিয়ে থাকে তা সহসা তুলে নেওয়া হবে না। যেসব উন্নত দেশগুলো কলার চালান নিয়ে কদলীযুদ্ধের জন্য পাঁয়তারা করে এবং কদলী প্রজাতন্ত্রগুলোর অর্থনীতির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় ভবিষ্যতে তাদের কী কায়দা-কসরত হবে তা বলা মুশকিল।

চিনি, কফি, তুলা এবং অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সহজে উৎপাদনযোগ্য কৃষিপণ্যের বিশ্ববাজার আজ জঘন্যভাবে বিকৃত। ধনী কৃষিখামারের মালিকদের ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলার। চিনির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আফ্রিকার বিভিন্ন দরিদ্র দেশের আমদানির ওপর শতকরা ১৪০ ভাগ শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের বিট-শর্করার উৎপাদকদের কেবল ১.৬ বিলিয়ন ডলার সাহায্যই

দিচ্ছে না, তাদের উদ্বৃত্ত চিনি বহির্দেশে অল্প দামে চালান দেওয়ায় বিশ্ববাজারে চিনির বাজার আজ অস্থিতিশীল। এহেন মুক্তবাজারের আশু পরিবর্তন হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। ধনী দেশের কৃষিখামারগোষ্ঠী মৌলবাদী মুক্তবাজারপন্থীদের খাতিরে কোনো ছাড় দেবে সে আশা করা বাতুলতা। দরিদ্র দেশের কৃষিপণ্যের উৎপাদকদের পক্ষে কমোডর পেরির মতো কেউ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে জাপানের বাজার খুলে দেওয়ার জন্য ইয়াকোহামা বন্দরে মার্কিন রণতরী হাজির হয়েছিল। চীনের মহাদেশীয় ভূখণ্ড বাণিজ্য মুক্ত করার জন্য প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে যে কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিল তা অনুসরণ করার যোগ্যতা বা সাহস দরিদ্র দেশের থাকার কথা নয়।

মুক্তবাজারের যারা প্রবক্তা তাদের কাছে উন্নয়নশীল দেশের তরুণরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে 'ভিসামুক্ত বিশ্ব চাই'। উন্নত দেশের ভবীরা সে কথায় ভোলে না। তাঁরা উন্নয়নশীল দেশের পণ্যের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ডাম্পিং আইন প্রয়োগ করে।

আমরা অনেক সময় মোটা দাগের মোদ্দা কথায় একমত পোষণ করি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় দেশের অর্থনীতিতে আইনকে বড় গুরুত্ব দেওয়া হয়। চুক্তি ও আদালতের রায়ের ভবিষ্যবাচ্যতা বা অগ্রকথন যোগ্যতা সম্পর্কে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে। এমন ঢালাও কথা শোনা যায় যে, প্রাচ্যের সমাজে আইনের তেমন গুরুত্ব নেই। এসব প্রতীচ্যকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় এও বলা হয় যে মুসলমানদের মধ্যে সুদ প্রথা না থাকার জন্য পুঁজিবাদ গড়ে উঠেনি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশে। বলা হয়, প্রোটেস্ট্যান্ট রিফরমেশনের মতোন কোনো আন্দোলন না হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-উদ্যোগ বিকাশ লাভ করেনি। এসব ঢালাও কথাগুলোর আলুনি স্বাদ শোধরাতে কয়েক চিমটি নুন মেশাতে হবে। প্রায় সব ধর্মই তো কুসীদ প্রথার বিরুদ্ধে। ইউরোপে রিফরমেশনের পরেও ধর্মান্ধতা, অসহিষ্ণুতা ও অমানবিক শাস্তিদান প্রোটেস্ট্যান্টরা চালু রেখেছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এক সময় যে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত তার রেশ এখনো তো সম্পুর্ণ মুছে যায়নি।

অনেকে বলেন, রাষ্ট্র বনাম বাজার মামলায় সোলে করার উদ্যোগে আদর্শিক ধ্যান-ধারণার ওপর জোর না দিয়ে বাজারের ব্যর্থতা ও সরকারের ব্যর্থতার তুলনামূলক বিবেচনাটাই মুখ্য। ভালো কথা। কিন্তু সেই বিবেচনাটা কোন তথ্য-প্রমাণের ওপরে নির্ধারিত হবে? মানুষের জীবনে যেমন, তেমনি শিল্প বা কৃষিক্ষেত্রেও একই যাত্রায় বিভিন্ন ফল হয়। কৃষি উৎপাদনের জন্য সহায়ক হতে পারে কৃষির সম্ভার-সম্ভরণের বাজার মুক্ত করে দিলে। আবার এ ব্যাপারে বাজার সম্পুর্ণ অনিয়ন্ত্রিত হলে সুষম বীজ, জুতসই যন্ত্র বা ভালো সারের জায়গায় বাজে বীজ, জোড়াতালি দিয়ে কাজ-সারা ভঙ্গপ্রবণ নিম্মানের যন্ত্রাংশ বা ভেজাল সারে বাজার সয়লাব হতেও পারে, হয়ও। বিষাক্ত বর্জ্য সার হিসেবে আমাদের দেশে বিদেশ থেকে চালান এসেছে। অর্থনৈতিক সংস্কারে আদর্শিক গবেষণার চেয়ে তথ্যভিত্তিক নিরীক্ষা ও সংসারের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সামরিক ক্ষমতায় শক্তিমান যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে প্রতিরক্ষা খাতের প্রভাব অপরিসীম। আমাদের সম্ভাব্য সামরিক ক্ষমতার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবে আমরা সামরিক খাতে অনুপাতহীন ব্যয় করি। এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার যে চেষ্টা হয় তা গোপন থাকে না। সাধারণ লোক কিছু জানতে না পারলেও, পশ্চিমা দেশের পেশাদার মিলিটারি ও স্ট্রাটেজিক প্রতিবেদনে যথেষ্ট খবর থাকে। দেশের অবসরপ্রাপ্ত কোনো কোনো জেনারেল দুঃখ করে বলেন, এ পর্যন্ত আমাদের কোনো জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারণ করা হয়নি। আমরা প্রতিরক্ষায় কোন দেশকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব?

ডেনমার্ক না সুইজারল্যান্ড?

জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তা বাহিনীতে ওই প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়সঙ্কোচের জন্য আমাদের মাঝেমধ্যে ডাক পড়ে। সেই বাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তিরক্ষা, অন্ত র্ঘাতের মোকাবিলা, জলদস্যুদের হাত থেকে নৌবাণিজ্য রক্ষা এবং হামলাকারী শত্রুর বিরুদ্ধে নিদেনপক্ষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন ডাকা পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য যে-ব্যয় অপরিহার্য মনে হতে পারে তাও কম নয়।

আমরা গত ৩০ বছরে প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় করেছি তার একটা নিরপেক্ষ সমীক্ষার প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক না অন্তরায়? রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করে যে রেন্ট সিকিং বা অনর্জিত আয়ের জন্ম হয়েছে তার মাত্রা কেমন? এ প্রসঙ্গে গত ৩০ বছরে আমরা আন্তর্জাতিক ঋণসংস্থা থেকে যে ঋণ পেয়েছি তা পেয়ে আমাদের কী লাভ হয়েছে, এবং না পেলে আমাদের কী দুর্গতি হতো, তারও একটা হিসাব দরকার। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরো যেসব চমকপ্রদ গবেষণার অবকাশ রয়েছে তা আমার চেয়ে আপনারা ভালো জানেন।

আজ উন্নতির জন্য বড় প্রয়োজন শিক্ষার। উন্নত প্রযুক্তির জন্য দরকার বিদগ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যার সমুৎকর্ষ কেন্দ্র। এই বিনিয়োগ বেসরকারি খাতে হওয়ার নয়। সরকারি উদ্যোগেই এই খাতে দরাজ হস্তে বিনিয়োগ করতে হবে। সুফলের জন্য ধৈর্যও ধরতে হবে।

আজ যেমন বিশেষজ্ঞের যুগ, তেমনি সর্ববিদ্যায় চলনসই সাধারণ পরিচয় রক্ষারও যুগ। মাইক্রো-জ্ঞানের চেয়ে ম্যাক্রো-জ্ঞানের প্রয়োজন বড় গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডাম স্মিথ শুধু ওয়েলথ অব নেশনস (১৭৭৪) লেখেননি। তিনি দ্য থিওরি অব মরাল সেন্টিমেন্টস (১৭৫৯), লেকচার্স অন জুরিসপ্রুডেন্স, এসেজ অন ফিলজফিক্যাল সাবজেক্টস-এর প্রণেতা। জ্যোতির্বিদ্যায়ও তাঁর ছিল বিচরণ। এহেন বিশ্ববিহারী না বলেছেন, 'বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁদের কল্পনার আদর্শগুলোর সঙ্গতি রক্ষাকল্পে ইন্দ্রিয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণকেও বাদ দিয়ে দেন।' যারা মুক্তবাজারের মোসাহেবি করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে মুক্তবাজারের গণতন্ত্রের পরিবর্তে মুক্তবাজারের চৌর্যতন্ত্রের পক্ষে সায় দেন এবং সুপারিশ করেন তাঁদের এবং তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখন আসেনি। মামলা যখন সরল নয় তখন রায় সিএভি থাকে, পরে দেওয়া হয়। আরো খুঁটিয়ে ও খতিয়ে দেখার জন্য আদালত সময় নেয়। মুক্তবাজার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এখনো অপ্রতুল, বিশেষ করে যখন কত বিভিন্ন ধরনের বাজার না আমরা এখন লক্ষ করি পূর্ব এশিয়ায়, আফ্রিকায়, আরব দুনিয়ায় এবং এমনকি খোদ পশ্চিম ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রে।

কনফুসিয়াস বলতেন, যখন মানুষ একজন মানুষকে বড় বেশি ঘৃনা করে তখন তার তদন্ত হওয়া উচিত এবং যখন মানুষ একজন মানুষকে বড় বেশি পছন্দ করে তখনও তার তদন্ত হওয়া উচিত। বাজারের পক্ষে-বিপক্ষে এবং সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে আজ যখন তুমুল ফাটাফাটি বাহাস তখন এ সম্পর্কে নির্মোহ গবেষণা একান্ত প্রয়োজন।

দেশে বিভিন্ন মত ও পথ, শুধু বিভিন্ন মত ও পথই নয়, সম্পুর্ণ বিপরীতধর্মী মতাদর্শের মধ্যে সহঅবস্থান ও সহিষ্ণুতা থাকা প্রয়োজন। আমাদের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা বা অতীতচর্চা গত ৩০ বছরের মধ্যে সীমিত না রেখে, মানবজাতির সার্বিক প্রচেষ্টার পটভূমিতে নিজের দেশের বর্তমান পশ্চাৎপদতা এবং ভবিষ্যৎ

অগ্রযাত্রার সম্ভাবনার কথা ভাবতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে কোনো মঙ্গলময় পন্থার অনুসরণ প্রায় সকলের জন্য ভালো মনে হলেও ভিন দেশের মাটিতে একই প্রক্রিয়া অনুকরণ করে আশানুরূপ ফসল ফলে না। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের চারা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশে রোপণ করে তেমন ভালো ফসল হয়নি, অর্থনীতির বিষয় শুধু পরিসংখ্যান আর সারণিতে সীমাবদ্ধ নয়।

আজ বিশ্বে যে ১.২ বিলিয়ন লোক দিনে ৬০ টাকাও রোজগার করতে না পেরে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের অতি ক্ষুদ্রাংশ সরকারি খাতে কাজ করে। সারা দুনিয়ায় সরকারি খাত সঙ্কুচিত হচ্ছে। আজ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অবসায়নে সরকার শুধু সোনালি মোসাফা করেই খালাস।

মুক্তবাজারের ধকল যেন ছাঁটাই শ্রমিকদের বা বেকারের জন্য সুসহ হয় তার জন্য তাদের নতুন করে প্রশিক্ষণের কথা উঠেছে। এ ধরনের কাজ কিন্তু মুক্তবাজারের কর্তারা করবেন না। এ কাজ সরকারকে করতে হবে।

বারো-তেরো কোটি মানুষের বেশির ভাগ লোকের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত হলেও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না। সাধারণ মানুষের রুটি রোজগারের পথ প্রশস্ত করতে পারলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারও বড় হবে। ইতিহাসে আমরা দেখেছি বৈদেশিক বাজারে- আমাদের বস্ত্রশিল্প, নীল, পাট বর্তমানে তৈরি পোশাক-ফ্যাশন, একেক সময় দারুণ সাফল্য লাভ করে। আবার বহির্জগতে চালচলন, বদলে যাওয়ার সাথে সাথে বিদেশের বাজার আমরা হারিয়ে ফেলছি। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যের সৈন্যবাহিনীতে উর্দির সাজসরঞ্জাম, ঝালর ইত্যাদি কারুকর্ম বিক্রি করে আমরা বেশ ভালোই রোজগার করতাম। হঠাৎ সে অঞ্চলে ইউরোপীয় ফ্যাশনে ইউনিফর্ম চালু হওয়ার পর পুরনো চাহিদা হঠাৎ করে উবে গেল। পাটের রমরমা বাজার কোরিয়ার যুদ্ধ পর্যন্তও ছিল এখন নেই। এক সময় চীন দেশের জন্য ঢাকা বিমানবন্দরের দারুণ গুরুত্ব ছিল। এখন বহির্বিশ্বের সঙ্গে যাতায়াতের জন্য চীনের হাজারটা পথ। বৈশ্বিক বাণিজ্যের যে ঝুকি আছে তা ২০০৫ সালের পরে বাড়বে না কমবে তা এখন সঠিকভাবে বলা যাবে না। অভ্যন্তরীণ বাজারে আমাদের যে মনোযোগ দেওয়া উচিত তার আর দেরি করা সমীচীন হবে না।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশকে একদিকে ক্ষুদ্র অথচ উন্নত, এবং অন্যদিকে ধনী দেশের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক রাখতে হবে। ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও শক্তিহীনের জন্য অর্থনৈতিক কূটনীতি একটা বড় আশ্রয়। আমাদের চোপায় দড় হতে হবে। জোহানেসবার্গ বিশ্ব সম্মেলনে দরিদ্র ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি তাঁর একটি বক্তব্য, যা সকল গরিব দেশের বক্তব্য, তা সকল দেশের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়মবিধির সম্মুখে পরিবেশগত সমঝোতাগুলোকে অধস্তন ভূমিকা পালন করতে বাধ্যবাধকতার চাপ সৃষ্টি করা হবে না।

সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে যে মানুষ ব্যক্তিটি আছেন তিনি কঠিন মহাশয়। তাকে পুরো বোঝা যায় না। তিনি অনেক সময় ষড়রিপুর দ্বারা পীড়িত হন। অপরের মঙ্গলের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। নিরূপায় প্রতিহত বা বঞ্চিত ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হলে তাঁর মনে ক্ষোভ গুমড়ায়, সন্ত্রাসের হাতছানি বা বিস্ফোরণের আওয়াজে তাঁর দেহমনে শিহরণ জাগায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানব উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে কেন্দ্র করে কোনো পরিকল্পনা করা সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। অর্থনীতিশাস্ত্র সেই মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। লেমা, গ্রাফ, টেবল সমগ্র চিত্রকে বোঝার জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি অন্তরায়। বাজার অর্থনীতিতে

অসফলের স্থান নেই। অসফল প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হবে। সম্ভব হলে তার পুনঃসংস্কার, না হলে তার সৎকার করতে হবে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র, রোগগ্রস্ত, সংসারযুদ্ধে পরাজিত, সামরিক যুদ্ধে বন্দি, অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ সকলের পরিত্রাণ ও মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। মানুষকে কোনো অর্থনীতিবিদ বলতে পারেন না, 'তুমি দেউলিয়া হয়ে যাও।' একান্ত অপারগ হলেও তাকে বলতে হবে, 'ভেবে দেখি, কী করা যায়।'

অর্থনীতি না কি ডিসম্যাল সায়ান্স! এমন বিষণ্ন বিষয়ের যে অন্তর্নিহিত আকর্ষণে বড় বড় অর্থনীতিবিদ মজেছেন সেই পথে আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদদের যাত্রা শুভ হোক, এই কামনা করে, এবং দারিদ্র্যের কর্দমে কমল প্রস্ফুটিত হলেও হতে পারে-এই আশা করে আমি আজকের মহতী সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।